প্রথম অধ্যায়

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কোচবিহারের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি

কোচবিহার বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আঠারটি জেলার অন্যতম একটি জেলা যা পশ্চিমবঙ্গের পূর্বোত্তর প্রান্তে অবস্থিত। ৩৩৮৬ বর্গ কি. মি. আয়তনের এই জেলাটির দক্ষিণে বাংলাদেশ, পূর্বে আংশিকভাবে বাংলাদেশ ও আসাম, উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলা, পশ্চিমে জলপাইগুড়ি জেলা ও বাংলাদেশ। কোচবিহারের অক্ষাংশ হল উত্তর দক্ষিণে ২৬°৩২'২০'' থেকে ২৫°৫৭'৪০'' উত্তর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ হল পূর্ব পশ্চিমে ৮৭°৫৭' ৩৬'' থেকে ৮৮°৪৭'৪০'' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

২০০১ এর জনগণনা অনুসারে এই জেলার বর্তমান লোকসংখ্যা হল ২৪,১৮,২৮০ জন। যদিও আজ কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা মাত্র, কিন্তু অর্ধশতাব্দীরও কম সময় পূর্বে সমগ্র ভারত উপমহাদেশের মানচিত্রে কোচবিহার ছিল স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান রাষ্ট্রীয় সত্তা, যদিও সর্বদা সর্বাংশে স্বাধীন নয়। কোচবিহারের ১৫১০-১৯৪৯ প্রায় চারশ চল্লিশ বৎসর ধরে কখনো স্বাধীনতা, কখনো বা অর্ধস্বাধীনতা ইত্যাদি বহু উত্থান পতনের সোপান অতিক্রম করে যে ধারা প্রবহমান ছিল তার পট পরিবর্তন হয় ১৯৪৯ সালের ২৮ শে আগষ্ট কোচবিহারের শেষ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর ও ভারত সরকারের প্রতিনিধি ভি. পি. মেননের মধ্যে সাক্ষরিত ভারত ভুক্তির দলিল সাক্ষরের মাধ্যমে।

পালাবদলের পাশাপাশি আসে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক পালাবদলও। বিশেষ করে দেশবিভাগের ফলে সাবেক পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাস্তুহারার দল এখানকার জনসংখ্যাগত ভারসাম্যকে বিপরীতমুখী করে দেয়। তবে দুঃখের তিমিরে মঙ্গল আলোক প্রজ্জ্বলনের মতই দেশবিভাগের বেদনাদায়ক ঘটনায় কোচবিহারের জনজীবনে দেখা দেয় নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত। কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পে ব্যাপক রূপান্তরের প্রভাব যেমন অর্থনীতিতে দেখা দেয় ঠিক তেমনিভাবেই শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও দেখা দেয় নতুন দিগন্ত। স্ত্রীশিক্ষা সহ সাধারণ শিক্ষার যেমন প্রসার হয় ব্যাপকভাবে ঠিক তেমনিভাবে সাহিত্যের অঙ্গনও ভরে উঠেছে নিত্য নতুন ফসলে। স্থানীয় ও বহিরাগত উভয় অংশের মিলিত সাধনার ফল হয়ে উঠেছে বৃহত্তর বঙ্গ সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করার আগে কোচবিহারের অতীতের বিশেষ করে স্বাধীনতাপূর্ব যুগের সমাজ , সাহিত্য, সংস্কৃতির বিস্তৃত না হলেও স্বল্প পরিসরে হলেও সম্যক আলোচনা প্রয়োজন। কেননা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নিরালম্ব নয়, অতীতের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপরই তার অধিষ্ঠান। তাই প্রথমেই প্রয়োজন কোচবিহার রাজ্য, তার নামকরণ ও রাজবংশ সম্পর্কে সম্যক ধারনালাভ।

কোচবিহারের নামকরণ ও রাজ্যসীমা

যোগিনীতন্ত্রে উল্লেখ আছে যে, করতোয়া ও ডিক্রাই-এর অন্তর্বর্তী স্থান নিয়ে কামরূপ অবস্থিত ছিল এবং এই রাজ্যের সীমা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাইরে রংপুর ও কোচবিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিউয়েন সাং এই রাজ্যের পরিধি ১০,০০০ লি. বর্ণনা করেছিলেন, যার থেকে জেনারেল ক্যানিংহাম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, কোচবিহার ও ভূটান সহ ঐ রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল (১) তবে বিষ্ণু, কুর্ম, ব্রহ্ম, কালিকাপুরাণ, রঘুবংশ ও সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে 'কামরূপ' নামের উল্লেখ আছে। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রালফ ফিচ্ এই দেশের নাম 'কোচ' বলেছেন। 'তারিখে ফেরিস্তা', 'আকবরনামা' ও তোজকে জাঁহাগিরী'তে এ দেশের 'কোচ' নাম আছে। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী ষ্টিফেন ক্যাসিলা এই দেশের নাম 'কোচ' ও রাজধানীর নাম 'বিহার' বলেছেন (২)।

১৭শ' শতকে 'বাদশাহনামা' ও 'শাহজাঁহানামা'য় এই দেশের পশ্চিমার্ধের নাম কামতাস্থলে 'কোচবিহার'ও কামরূপের পরিবর্তে 'কোচহাজো' বলা হয়েছে। ১৭ শ' শতকের নবাব মীর জুমলার সহযাত্রী জনৈক ওলন্দাজ নাবিকের বর্ণনায়, ১৮ শ' শতকের 'মাসেরে আলমগিরী', 'ফতুহাতে আলমগিরী'তে 'কোচবিহার' নাম আছে। বিশ্বকোষ

পুস্তকের বক্তব্য অনুযায়ী লক্ষ্মীনারায়ণ রাজার পূর্বে এই দেশের নাম 'বিহার' ছিল। পরে মোগল অধিকৃত 'বিহার' প্রদেশ হতে পার্থক্য বোঝাবার জন্য ' কোচবিহার' নামকরণ হয়েছে।

' কোচবিহার' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিভিন্ন লোকমতগুলি প্রচলিত আছে সেগুলি হল— কোচবিহার হল কোচ জাতির বাসস্থান। কোচকুমারী ও মহাদেবের বিহারক্ষেত্র বলে এই স্থান কোচবিহার। কারও কারও মতে পরশুরামের ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়রা ভগবতীর ' কোচে' বা ক্রোড়ে আশ্রয় নেবার পর কোচ নামের উৎপত্তি হয়। আবার কারও কারও মতে ক্ষত্রিয় জাতির সঙ্কোচ অবস্থা থেকে 'কোচ' শব্দের উৎপত্তি। বিশ্বকোষে 'কোচ' শব্দের অর্থ সঙ্কোচ বলা হয়েছে। 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (ব্রহ্ম খন্ড, দশম অধ্যায়), দেবীবর মিশ্র রচিত ' মেলবিধি'তে 'কোচ' জাতির ও ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'কূলকারিকা'য় 'কোচক' দেশের নাম আছে। 'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'জল্পেশ্বর শিবের বিহার' স্থান হেতু এই স্থানের নাম কোচবিহার।

বৌদ্ধ মঠগুলি 'বিহার' বলে পরিচিত। কারও কারও মতে পাটনা জেলাকে কেন্দ্র করে এক বিস্তৃত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ঘটেছিল বলে এই স্থান বিহার বলে পরিচিত।

বস্তুত কোচবিহার নগরপ্রান্তে, ভূটান পর্বতে মহাকালধাম, গোয়ালপাড়ায় মঙ্গলচন্ডী ও যোগীঘোপা, কামরূপ জেলার মঙ্গলচন্ডী, নওগাঁয়ে যোগীজান, দরঙ্গে চন্ডীকাবিহার ও সিঙ্গরী ও লক্ষ্মীপুরের খামতী রাজ্যের বৌদ্ধদের স্থান বৌদ্ধ যুগের স্মৃতি বলা চলে। (৩)

১৬ শ' শতকে অহোমরাজ সুখামফা কামতারাজ নরণারায়ণকে 'বিহারেশ্বর' বলে উল্লেখ করেছেন ও নেপালে আবিষ্কৃত ১৭ শ' শতকের মন্দির লিপিতে এই দেশের নাম 'বিহার' বলা হয়েছে। মেজর রেনেলের মানচিত্রেও রাজধানীর নাম 'বিহার' বলা হয়েছে।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্প্যানী-এর সাথে ১৭৭৩ সালে সাক্ষরিত চুক্তিতে রাজ্যের নাম 'কোচবিহার' ও রাজধানীর নাম 'বিহার দুর্গ' বলা হয়েছে।

ডাক্তার বুকালন হ্যামিলটনও 'বিহার' নামের উল্লেখ করেছেন।

স্যার উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন যে, কোচবিহার রাজদরবারে 'নিজ বিহার' লেখা হয়। ১৭ শ' শতকের মধ্যভাগে মোগল অধিকৃত প্রদেশে 'সরকার কোচবিহার' সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ সময় থেকে 'নিজ বিহার' থেকে 'কোচবিহার' রাজ্যের বিশেষত্ব রক্ষা করা হত বলে অনুমান করা হয়।

শেষ পর্যন্ত কোচবিহার রাজ সরকারের এক নির্দেশে ১৮৯৬ সাল থেকে কোচবিহার রাজ্যের পরিচিতি 'কোচবিহার (Cooch Behar) বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

তবে কোচবিহার রাজ্যের সীমা প্রসঙ্গে বলা যায় এই সীমা কখনো অপরিবর্তিত থাকেনি। রাজকীয় পরাক্রমের হ্রাসবৃদ্ধির সাথে রাজ্যের আয়তনেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়েছে। তবে ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে সীমান্তরেখা চিহ্নিত হবার পর ভুটিয়া আক্রমন যেমন হ্রাস পায় তেমনি রাজ্যের সীমা ও সংকুচিত হয়।

জন পরিচিতি

রাজ্য সীমার সংকোচন ও প্রসারণের সাথে স্বাভাবিকভাবেই হ্রাসবৃদ্ধি হয়েছে জনসংখ্যারও। যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী প্রদত্ত ১৮৮১ সালের লোকগণনা অনুসারে কোচবিহারের লোকসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ। (৩)

হিন্দু	৪২৭৪৭৮
মুসলমান	১৭৪৫৩৯
খৃষ্টিয়ান	৪৮
জৈন	১৪৪
সাঁওতাল	১৯
আদিম জাতীয়	৩৯৬

হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই আবার রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাছাড়া আর্যবংশ সম্ভূত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কায়স্থও আছে। তাছাড়া কোচ, মেচ, গারো, দোভাষীয়া, মোড়ঙ্গিয়া প্রভৃতিও আছে। এ. ক্লড. ক্যাম্বেল তাঁর 'গ্লিম্পসেস্ অব্ বেঙ্গল' বইতে কোচবিহারের জনসংখ্যা ৬,০০,০০০ মত বলে উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে হিন্দুর

সংখ্যা ৪,০০,০০০এর কিছু বেশি, মুসলমান ৩০ শতাংশ, আর বাকি জনসংখ্যা প্রাক্ আর্য জনকোম ও মেচ, গারোর সংমিশ্রণ বলে উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য ক্যাম্বেল প্রদত্ত এই পরিসংখ্যান যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী প্রদত্ত উপরি উক্ত পরিসংখ্যানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ক্যাম্বেল প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী দেশীয় হিন্দু ও কোচ সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সংখ্যা ছিল ৩,৫২,৪০৯ জন। এদের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত না হতে পারলেও এরা ৪০০ বৎসর পূর্বে ঘটে যাওয়া কোচ ও মেচ এই দুটি জাতের মিশ্র বিবাহের ফল সম্পর্কিত লোকশ্রুতি তাঁর কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। তবে এদের উৎপত্তি সম্পর্কে দ্রাবিড়িয়ান ও লোহিত মিশ্র বিবাহের তত্ত্বও তাকে প্রশ্নাকুল করেছে বলা যায়। তাছাড়া খেন সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুদের সংখ্যাও ৪,৭৫৫ জন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। (সুত্র ঃ - পৃঃ১৪, ক্যাম্বেলের চোখে কোচবিহার, নৃপেন্দ্র নাথ পাল) । কোচবিহার রাজ্যের প্রাক্তন নায়েব আহিলকার বা এস. ডি. ও শ্রী হেমন্ত কুমার রায় বর্মা মহাশয় এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'ভারতের দুইটি জাতির নাম রাজশব্দযুক্ত: রাজবংশী এবং রাজপুত। রাজপুতগণ ক্ষত্রিয়। এই রাজবংশী শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। যদি রাজবংশী জাতি সংস্কৃতভাষী আর্য্য না হইবে তাহা হইলে এই জাতির নাম সংস্কৃত 'রাজবংশী' হইল কিরূপে? এই জাতির নামত রাভা, সাঁওতাল, গারো, মেচ প্রভৃতি নহে। এই রাজবংশী শব্দটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এই জাতি আর্য্য এবং সংস্কৃতভাষী। রাজবংশী শব্দের অর্থ রাজার বংশ। প্রাচীন ভারতের রাজাগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং রাজবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া রাজবংশী জাতি ক্ষত্রিয় ইহাই প্রমাণিত হয়।

উত্তরবঙ্গে একটিমাত্র আর্য্যজাতি রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাহারা হইলেন 'কম্বোজায়জ গৌড়পতি' যাহাদের কথা দিনাজপুরের বাণগড়ে প্রাপ্ত স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত আছে।' সুতরাং এই কম্বোজ রাজবংশ থেকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে এটা তাঁর মতে সঙ্গত সিদ্ধান্ত। (পৃঃ ১৩-১৪, কোচবিহারের ইতিহাস, হেমন্ত কুমার রায় বর্ম্মা)। একটিমাত্র স্তম্ভলিপির উপর ভিত্তি করে এই রকম একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কতদূর বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় বহন করে সে বিতর্কে না প্রবেশ করেও বলা যায় যে, হেমন্তবাবু ভাষা ও জাতীয়তা একার্থক বলে ধরে নিয়েছেন। ভাষা ও জাতীয়তা বহুক্ষেত্রে একার্থক হলেও সবক্ষেত্রেই তা নয়। ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই ভূগোল ও জাতীয়তার সীমানা অতিক্রম করে বহুদূর ব্যাপ্তি লাভ করে। যেমন ইংরেজি, ফরাসী ও স্পেনীশ ভাষা বর্তমানে এমন বহু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মাতৃভাষা যারা নৃতাত্বিক বিচারে ইংরেজ ফরাসী বা স্পেনীশ নয়। তাছাড়া কোন সম্প্রদায়ের পরিচয় জ্ঞাপক শব্দটি সংস্কৃতজ এই যুক্তি সঠিক হলে 'সাঁওতাল' জাতিও আর্য্যজাতিসম্ভূত। কেননা 'সাঁওতাল' শব্দটি তৎসম শব্দ 'সামন্তপাল' থেকে উদ্ভূত। কিন্তু একথা সকলেরই জানা যে, সাঁওতালজাতি নৃতাত্বিক বিচারে 'প্রোটো-অস্ট্রলয়েড' বা 'আদি অস্ট্রেলীয়' গোষ্ঠীর অন্তর্গত। আসলে হেমন্তবাবু রাজবংশী জাতি আর্য্যজাতি সম্ভূত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গিয়ে কেবল ভাষাগত লক্ষণগুলিই বিচার করেছেন, নৃতাত্বিক লক্ষণগুলিকে বিবেচনার মধ্যে আনবার প্রয়োজনই অনুভব করেন নি। ফলে তার সিদ্ধান্তকে সঠিকভাবে বিজ্ঞান নির্ভর নয় নিশ্চিন্তে বলা যায়।

বিদেশী শাষণকালে গ্রীয়ার্সন, রিজলী, সান্ডার, হান্টার, মার্টিন, বুকাননের মত গবেষকরা উত্তরপূর্ব ভারতের আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে আলোচনা করলেও উত্তরবাংলার রাজবংশীদের সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে আলোচনা করেন চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর 'দি রাজবংশীজ অব নর্থবেঙ্গল' গ্রন্থে। তবে ' বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার কোচজাতির কথা উল্লেখ করলেও তাদের বাঙালী বলে মানতে বোধ হয় দ্বিধা ছিল।

খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা তাঁর ' কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খন্ড)' গ্রন্থে কোচবিহার রাজ্যের রাজবংশী জাতির উৎপত্তির আলোচনায় অধিক মাত্রায় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেছেন।

প্রখ্যাত ভাষাতত্ববিদ্ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কিরাত জনকৃতি' বইতে বাঙ্গলার অন্যান্য অধিবাসীর ন্যায় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এদের মূলতঃ মঙ্গোলীয় বংশদ্ভূত বলে বর্ণনা করেছেন। মঙ্গোলীয় জাতি গোষ্ঠীর যে দৈহিক লক্ষণগুলি লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল চ্যাপ্টা নাক, দীর্ঘ চোয়াল, ক্ষুদ্র চক্ষু ও হ্রস্ব ভ্রূ। বলা বাহুল্য রাজবংশী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এই লক্ষণগুলি সাধারণভাবে দৃশ্যমান। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'বাংলাদেশের জনসাধারণের কোন কোন অংশে মঙ্গোলীয় রক্তের একটি ধারাও বিশেষভাবে নজরে পড়ে।........দক্ষিণ পশ্চিম চীন হইতে ইহারা ক্রমশ ব্রহ্মদেশ মালয় উপদ্বীপ ও পূর্ব দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী

দেশ ও দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পথে উত্তর পূর্ব আসামে এবং উত্তর-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মিরি, নাগা, বোদো বা মেচ প্রভৃতি লোকদের ভিতর, কোচ, পালিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের ভিতর ইহাদের একটি ধারা প্রবাহ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাধৃত ধারাটির একটি প্রবাহ বাংলাদেশেও ঢুকিয়া পড়ে এবং রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এই ভাবেই খানিকটা মঙ্গোলীয় প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।'

স্যার হারবার্ট রিজলী তাঁর 'ট্রাইবস্ এ্যান্ড কাস্টম অব বেঙ্গল' বইয়ে বাঙ্গালীরা মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় এই দুটি জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলে মন্তব্য করেছেন। রিজলীর মতে বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, চট্টগ্রামের রাজবংশী মগ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মাল, জলপাইগুড়ি ও রংপুরের কোচ জাতিরা একই পর্য্যায়ভুক্ত। রিজলীর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কারণ হল এতদঞ্চলের অধিবাসীদের বিস্তৃতশিরস্কতা (Bracly Cephalic) ও বিস্তৃতনাসিকা (Platyrrhine) দেহবৈশিষ্ট। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, মাথার দীর্ঘতার তুলনায় মাথার চওড়ার দিকের মাপের শততমাংশিক অনুপাত যাকে (Cephalic Index) বা শিরসূচক সংখ্যা বলা হয় তা বিস্তৃতশিরস্ক দের ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ বা ততোধিক এবং নাকের দীর্ঘতার দিকের মাপের শততমাংশিক অনুপাত যাকে (Nasal Index) বা নাসিকা সূচক বলা হয় তা বিস্তৃতনাসা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ৮৬ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। তবে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ডঃ অতুল সূর অবশ্য রিজলীর এই মন্তব্যর সাথে একমত নন। (৫)

একথা সত্য রিজলীর মতামত অন্যান্য অধিবাসীদের ক্ষেত্রে সত্য যদি নাও হয় কোচবিহার, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার কোচ জাতির উদ্ভবের ক্ষেত্রে সত্য। সুনীতিকুমারের মতের সাথে রিজলীর মতের সাযুজ্য এই বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করে। তাই সবদিক বিচারে এতদঞ্চলের রাজবংশীরাও মূলতঃ মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত বলা চলে।

সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি

কোন জাতিগোষ্ঠীর নৃতাত্বিক পরিচিতির সাথে সাথে যে বিষয়টির সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন তা হল সেই জাতির সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা। এবিষয়ে সমসাময়িক দেশীয় লেখক ও বৈদেশিক ভ্রমনকারিদের বিবরণী মূল্যবান দলিল বলা চলে। একথা হয়ত সত্য যে, সময়ের স্বল্পতাও ভাষার ব্যবধান জনিত কারণে ঐ পর্যটকগণ কখনো কখনো এতদঞ্চলের সমাজদেহের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন নি, কিন্তু একথাও সত্য যে, তাঁরা যা দেখেছেন তার ত্রুটি বিচ্যুতি সবকিছুই অবলীলাক্রমে বর্ণনা করেছেন, কেননা তাঁরা এখানকার শাসকবর্গের অনুগ্রহ প্রত্যাশী ছিলেন না, তেমনি এখানকার বাসিন্দা না হবার কারণে এখানকার শাসকবর্গকে ভয় পাবারও কোন সংগত কারণ ছিল না।

বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের মধ্যে হিউ-এন্-সাঙ্ সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপ অঞ্চলে আলেন। এতদঞ্চলের অধিবাসীদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হল এখানকার অধিবাসীরা উগ্র ও রুক্ষ স্বভাব বিশিষ্ট, তবে সৎ ও সরল, এবং একই সঙ্গে অধ্যাবসায়শীল ও শিক্ষানুরাগী। তারা খর্বাকৃতি ও দেহবর্ণ কৃষ্ণ। মরক্কোর ট্যাঞ্জিয়ার থেকে আগত ভ্রমণকারী ইবন বতুতা এখানকার লোকদের দেহাকৃতি তুর্কীদের অনুরূপ ও কঠোর পরিশ্রমী বলে বর্ণনা করেছেন। ফলে এই জাতির দাস অন্য জাতির দাস াপেক্ষা বেশি দামে বিক্রয় হত বলে মন্তব্য করেছেন। এর দ্বারা অনুমিত হয় যে, এই অঞ্চলে দাস ব্যবসা প্রচলিত ছিল এবং প্রয়োজনে দূর দূরান্তরেও দাসদের চালান করা হত। তবে কামরূপে মানুষ ক্রয় বিক্রয় অবাধ ছিল এবং পূর্ব আসাম ও দক্ষিণবঙ্গে বিক্রির জন্য চালান করা হত। অভাবে পড়লে লোকে পুত্রকন্যা এমনকি নিজেকেও বিক্রি করত। দাস ব্যবসার প্রয়োজনে বলপূর্বক অপহরণ করেও মানুষ সংগ্রহ করা হত। ফলে এই অঞ্চলে ছেলেধরার ভয় অমূলক ছিল না।

আনুমানিক নবম শতাব্দীতে কামরূপে 'ডাকের বচন' তৈরি হয়েছিল। 'যোগিনীতন্ত্র' ও 'কালিকাপুরাণ'ও কামরূপবাসীদের রচিত বলে অনুমান করা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে পল্লীবাসীদের দ্বারা গোপীচান্দ, গোরক্ষনাথ ও সোনারায়ের গীতি এতদঞ্চলে রচিত হয়েছে অনুমান করা হয়। তাছাড়া এই অঞ্চলের 'ছিলকা' বা হেঁয়ালীগুলির রচনাকৌশলও প্রশংসনীয়। এদেশী লোকেরা সঙ্গীত বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। শঙ্খ, ঘন্টা, করতাল,

দুন্দুভি, ঢাক, ঢোল ইত্যাদি বেয়াল্লিশ প্রকার বাদ্যযন্ত্র তারা ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে এ. ক্লড. ক্যাম্বেল বলেছেন গান এতদঞ্চলের লোকের সহজাত নয় বলে বাদ্যযন্ত্র কম দেখা যায়। যেগুলি দেখা যায় সেগুলি নিম্নবঙ্গের বাদ্যযন্ত্রের অমার্জিত সংস্করণ (ক্যাম্বেলের চোখে কোচবিহার— অনুবাদ নৃপেন্দ্র নাথ পাল)।

মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে এখানে কমলালেবু, গোলমরিচ, সুগন্ধি পুষ্প, পশ্চিমভারতে দুষ্প্রাপ্য অনেক ফলমূল, উৎকৃষ্ট মৃগনাভি, অগুরু কাঠ ইত্যাদি মূল্যবান জিনিস উৎপন্ন হত। তাছাড়া কার্পাস, কাঁঠাল ও নারিকেল গাছেরও প্রচুর চাষ হত। মাছ অপ্রচুর ছিল বলে পূর্ববঙ্গ থেকে শুকনো মাছ এখানে আমদানি করা হত। সীমান্তের অসভ্যরা মদ্যপানের অভ্যাসের সাথে পরিচিত ছিল। তবে লবন সুপ্রাপ্য ছিল না।

১৭৮৭ সালে কমিশনার মার্শী, ক্যাপ্টেন টার্নার প্রদত্ত বিবরণ থেকে কোচবিহার রাজ্যের ভয়াবহ অবস্থার কথা জানা যায়। সেই সময় প্রজাদের আর্থিক বা কোনপ্রকার নিরাপত্তা ছিল না বলে জানা যায়।

প্রজারা রাজস্বদানে অক্ষম হলে রাজকর্মচারীরা শষ্যর উপর টাকা দাদন দিতেন ও পরে সংগৃহিত শষ্যগুলি দুইগুণ বা তিনগুণ দামে বিক্রি করতেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তান ডানকানসনের অধীন সিপাহীরা প্রতি টাকায় মাসিক দুই আনা বা তিন আনা সুদে কৃষকদের টাকা ধার দিত ও বলপূর্বক তা আদায় করত। ফলে বহু প্রজা দেশত্যাগী হয়েছিল। সাধারণভাবে মহাজনদের সুদের হারও শতকরা ৭২ টাকার মত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে বর্ধিত ৩৬০ টাকা অর্থাৎ দৈনিক সুদের হার এক টাকা করে নেওয়া হত। বাংলার অত্যাচারী কর সংগ্রাহক দেবী সিংহের কোচবিহার রাজ্যে সহকারী ছিল হররাম সেন। তবে হররাম সেন ছাড়াও একপ্রকার মধ্যসত্বাধিকারী ছিল যারা কর সংগ্রহ উপলক্ষ্যে রায়তদের উপর অত্যাচার করত। (৮)

এখানে অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি। তবে অধিকাংশ লোকেরই কৃষিতে নতুন পদ্ধতি প্রহণে ঘোরতর অনিচ্ছা লক্ষণীয় বলে ক্যাম্বেল বলেছেন। অনেকেই যদিও ব্যবসা করতেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইগুলির মালিকানা ছিল মধ্যভারতীয় বা বাঙ্গালীদের হাতে, স্থানীয়দের হাতে নয়। তাছাড়া ক্যাম্বেলের বর্ণনা অনুসারে কুটিরশিল্প ছাড়া উল্লেখযোগ্য শিল্প এখানে ছিল না। তাও সস্তা জার্মান শিল্পজাত দ্রব্যর দাপটে এইগুলি নিঃশেষিত প্রায়। কোচবিহারের ১১৬৫ টি গ্রামে রাজ্যের ৯৭ শতাংশ লোকের বসবাস। এর মধ্যে কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল শতকরা ৮৮ শতাংশ, সেখানে বাংলাদেশে এই নির্ভরতার অনুপাত ছিল ৭৩ শতাংশ। আবাদী জমির অনুপাত ছিল গড়ে কৃষক প্রতি এক একরের দুই তৃতিয়াংশ যা মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে নিতান্তই অপ্রতুল। তাছাড়া কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে মৌসুমী বায়ু নির্ভরশীল ছিল। চাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনতে গিয়ে তারা যেমন মহাজনের কাছে ঋণগ্রস্ত হত, উৎপন্ন ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণে তাদের জীবনে নেমে আসত দারিদ্র্যের কশাঘাত। আয় কমার সাথে সাথে অধিকতর ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টিপাতও তাদের দারিদ্র্যের আর একটি কারণ। আগে কৃষকরা কৃষিকর্মের বাইরেও ঘরে ঘরে কুটিরশিল্পের মাধ্যমে বাড়তি আয় করত, কিন্তু সেগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যেমন রোজগার বন্ধ হয়েছিল তেমনি বিঘ্নিত হয়েছিল পারিবারিক শান্তির বলয়। ঐ সময়ে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বিভিন্ন সূত্রে গৃহিত কৃষকদের ঋণের পরিমাণ নিম্নরূপ—

ক) পুরাতন ঋণ পরিশোধ বাবদ	—	১৪%
খ) জমি সংরক্ষণ ও গবাদি পশু বাবদ	—	৪০%
গ) রাজস্ব বা খাজনা বাবদ	—	২১%

কোচবিহারের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে যে কথা বলার প্রয়োজন তা হল বৃটিশ শাসিত বাংলা দেশের ন্যায় এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না বলে যেমন পরিচিত মধ্যসত্বভোগীদের দেখা এখানে মেলেনি, তেমনি এমন বিশেষ কৃষিজীবি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যা অন্য কোথাও ছিল না। চাহিদার তুলনায় জমির সংখ্যা এখানে বেশি ছিল, জমির বন্দোবস্ত গ্রহণ উপসত্ব ব্যতিরেকে সরাসরি হত। রাজতন্ত্র থাকায় প্রজা হিসাবে কৃষকের সরাসরি স্বীকৃতি ছিল বলে সরাসরি ভূস্বামী কৃষক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। প্রশাসন জমির উপর স্বার্থহীন বহিরাগত আমলাদের হাতে থাকায় তাদের প্রণিত আইনকানুন স্থানীয় জোতদারেরা অপছন্দ করত বলে তাকে শোষণ বলে মনে করত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিকৃতি পরবর্তীকালে তৈরি করে আঞ্চলিকতার রং।

বস্তুত জমিই তৈরি করে গ্রামীণ জনগণের এক নতুন শ্রেণী সম্পর্ক। কেননা জঙ্গল কেটে জমি আবাদ করার প্রয়োজনে গভীর অরণ্যে কৃষকেরা আত্মীয় পরিজন সহ থাকতেন যেখানে প্রধান কৃষক হতেন কর্তা স্থানীয় যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হত দেওয়ানীয়া, যে একই সঙ্গে জোতদার ও কৃষক। দুঃস্থ আত্মীয়েরা ছিল অধম কৃষক। ভূমিতে পরিমাণগত পার্থক্য হয়ত কিছু পার্থক্যের সূচনা করত, কিন্তু অন্য ব্যাপারে তাদের সামাজিক স্তরে কোন পার্থক্য লক্ষিত হত না। সকলেই কৃষিজীবি বলে তেমন কোন শ্রেণী বিদ্বেষ লক্ষিত হত না।

কোচবিহারের গ্রামে বর্ণবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রাক-স্বাধীনতা আমল বা পরবর্তীকালেও তেমন লক্ষ্য করা যায় না। এরকারণ গ্রামঞ্চলের হিন্দুরা প্রায় সবাই ছিল একই বর্ণের ও মুসলমানরা প্রায় সবাই ছিল ধর্মান্তরিত ও সকলেই ছিল কৃষিজীবি। শোষক ও শোষিতের ধারণা তেমন করে গড়ে ওঠেনি। তবে পরবর্তীকালে জোতদার শ্রেণীর অনেকে বর্ণহিন্দুদের আচার আচরণ অনুকরণ করা আরম্ভ করায় এই অবস্থার পরিবর্তন হয়।

তবে বর্ণ বিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ না থাকায় এখানকার গ্রামীন সমাজের গোড়ার দিকের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল পূর্ব বা দক্ষিণবঙ্গের যে অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল সেখানে অকৃষিজীবি বর্ণহিন্দু ভূস্বামীরা কৃষি উদ্বৃত্তের এক অংশ শিক্ষাবিস্তার, পুকুর খোঁড়া, মন্দির নির্মাণ বা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যায় করত সেখানে সেরকম কোন প্রচেষ্টা এখানকার ভূস্বামীরা করেন নি বলে এখানকার গ্রামাঞ্চলে সামাজিক অগ্রগতির নিদর্শন মেলে না। তার কারণ উদ্বৃত্ত আদায় যেটুকু হত তা প্রায় চলতি ভোগেই ব্যয় হত, অন্য কিছু করা সম্ভব হত না।

এখানকার কৃষি জমির বিজ্ঞানসম্মত জরিপ হয়নি। তাই এখানকার প্রজাসত্ব বন্টন করা হত মৌখিকভাবে। প্রথম দিকে পাট্টা ও কবুলিয়ত প্রথা ছিল না, ছিল জোতদারী প্রথা ও রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীকে বলা হত সাঁজোয়াল। বেতন কম ছিল বলে ঐ কর্মচারীরা প্রায়ই অসৎ হত। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ উনবিংশ শতকে সাঁজোয়াল প্রথার বিলোপ করে ইজারাদারি প্রথা চালু করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই পরে গ্রাম্য জোতদাররা ইজারাদারদের অধঃস্তন স্বত্বাধিকারীতে পরিণত হন। আরেকটি প্রথা ছিল ভাগিয়ারী প্রথা, যেখানে যৌথভাবে একাধিক ব্যক্তি কোন জোতের অধিকারী হতেন। কোন কৃষককে প্রজা বলা হত যারা আসলে ছিল ভূমিহীন কৃষক। পরবর্তীকালে প্রজাই আধিয়ার, আবার দুঃস্থ ক্ষুদ্র জোতদারও নিঃস্ব হয়ে আধিয়ারে পরিণত হয়। জোতদারের অধীনস্ত আর যে স্থানাধিকারীর নাম পাওয়া যায় সেগুলি হল দরচুকানীদার, দরাদর চুকানীদার ইত্যাদি।

কোচবিহারের গ্রাম সমাজে উচ্চবর্ণের হিন্দুর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় না। উচ্চবর্ণের যে বৈদিক ব্রাহ্মণদের কোচ রাজারা খাগড়াবাড়িতে এনেছিলেন তারা স্থানীয় অধিবাসীদের পরিস্থিতি বুঝে পৃথক বিধান চালু করেন যা নবদ্বীপ ভট্টপল্লীর বিধান থেকে পৃথক এবং এগুলি আঠারটি গ্রন্থে 'কৌমুদি নবম' নামে পরিচিত।

গ্রামাঞ্চলে যে ব্রাহ্মণরা পূজা অর্চনা করতেন তাঁরা হলেন স্থানীয় অধিকারী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ যাদের অস্তিত্ব অন্য জায়গায় নেই। এখানকার বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণরা প্রথমাবধি ভূস্বামী , রাঢ়ি ব্রাহ্মণরা রাজকর্ম করতেন ও কখনো কখনো ব্রহ্মোত্তর জমি লাভ করতেন। বৈদিক ব্রাহ্মণরা পুজো অর্চনা নিয়ে থাকতেন ও এঁদের সামাজিক মর্যাদা ছিল না। উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় না থাকায় এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনুপস্থিত ছিল। এখানে যারা মধ্যবিত্ত বলে গণ্য হতেন তাঁরা ছিলেন মূলতঃ বহিরাগত এবং এঁদের দ্বারা মূলতঃ পরবর্তীকালে কোচবিহারের নগরায়ণ হয়। গ্রামাঞ্চলে ব্রাহ্মণরা অনুপস্থিত ছিল, উচ্চবর্ণের কায়স্থরা দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গায়, মাথাভাঙ্গায় ঢাকা-মানিকগঞ্জের সাহা উপাধিধারী বৈশ্যেরা থাকত। তবে কোচবিহারের শহরাঞ্চল হল মধ্যবিত্ত কেন্দ্রীক যার ভিত্তি ছিল কাঞ্চনকৌলিন্য ও বর্ণ কৌলিন্য উভয়ই। এ বিষয়ে বাংলার অন্যান্য শহরের সাথে কোচবিহারের কোন পার্থক্য ছিল না। (১০)

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ধরনের গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। রাজবংশীরা যে ধরনের দেবদেবীর আরাধনা করতো তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ঃ

(১) মদন বা কামদেবতার আরাধনা, (২) কার্তিক পূজা, (৩) জন্থাপ্রেত, (৪) বারুক ঠাকুর—হারিয়ে যাওয়া গরু, বাছুর, ছাগল ইত্যাদি ফিরে পাবার কামনায় এই দেবতার আরাধনা করা হয়, (৫) বুড়ী ঠাকুরানীর পূজা, (৬) হুদুমদেও — অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি কামনায় এই দেবতার পূজা করা হয়, (৭) মাষাণ দেবতা ও নানা ধরনের ব্রত পালন।

এর সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়েরই এমন কিছু লোকাচার ও বিধিনিষেধ ছিল যেগুলো সমাজ জীবনে এখনো অনেকাংশে প্রচলিত। যেমন— হিন্দুদের মধ্যে প্রথা ছিল যে, কেউ ভাগিনেয়র স্ত্রীর সাথে এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রথা ছিল কেউ তার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর সাথে কথা বলবে না, তাকাবে না, কোন দ্রব্য তার হাত থেকে গ্রহণ করবে না, এমন কি চরম শোকের সময়ও না। এ সম্পর্কে কোন যুক্তিপরায়ণ শিক্ষিত ব্যক্তি প্রতিবাদ করলেও সামগ্রিকভাবে আধুনিক শিক্ষার প্রতিই তখনকারা মানুষের আস্থা হারিয়ে ফেলতেন।(১২)

তবে প্রজাকল্যাণে আধুনিক শিক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা যিনি গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ। ১৮৫৯ সালে রাজ্যভার গ্রহণ করার পর তিনি জেনকিন্স স্কুল, হাইকোর্ট ও দেশ হিতৈষিণী সভা স্থাপন করেন। পরে দেশ হিতৈষিণী সভা কর্ণেল হটনের সভাপতিত্বে পুনর্গঠিত হয়ে 'কোচবিহার হিতৈষিণী সভা' নামগ্রহণ করে যার সদস্য সংখ্যা ছিল ২৯ জন। সভার তৃতীয় নিয়মে লিখিত ছিল ' এই সভাতে নীতি, পদার্থ, শিল্প-বিদ্যাদি, সাহিত্য, ইতিবৃত্ত, পুরাবৃত্ত, কৃষি, বাণিজ্য ও দেশহিতকর প্রভৃতি বিষয় সমালোচনা হইবেক' এবং এই প্রস্তাবগুলি কমিশনার সাহেবের কাছে পেশ করা যেত। এই সভার উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলনকে সর্ববাদীসম্মত করা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রদ করা। এই প্রস্তাবগুলি যে সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী তাতে সন্দেহ নেই।

কোচবিহারের সাহিত্য সংস্কৃতির স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে পূর্বোক্ত আলোচনাগুলি মুখবন্ধ হিসাবে কাজ করবে। কেননা, কোন অঞ্চলের সাহিত্য সংস্কৃতির স্বরূপের চাবিকাঠি সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রকৃতি ও তার ক্রমবিবর্তনের মধ্যে নিহিত থাকে। কোচবিহারের সাহিত্য আলোচনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করব প্রতিবেশি আসাম রাজ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে এতদঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতির গভীর সাযুজ্য। এই প্রসঙ্গে অসমীয়া সাহিত্যের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই অসমীয়া সাহিত্যের তিনটি, সুক্ষ্ম বিভাজনে চারটি যুগবিভাগের মধ্যে প্রথম যুগ (গীতিযুগ), ৩য় যুগ (রামায়ন প্রাক বৈষ্ণবযুগে পুরাণের অনুবাদ--- হেমসরস্বতী, মাধবকন্দলী, পিতাম্বর দ্বিজ) কৃত ও শঙ্করদেবের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব যুগ যা অসমীয়া সাহিত্য নবজাগৃতির যুগ বলে চিহ্নিত। এই যুগের রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যের রচনাগুলির সাথে অনেক ক্ষেত্রেই সাদৃশ্যপূর্ণ(১৩)। উদাহরণ হিসাবে প্রথমে আসামে প্রচলিত নাথ সাহিত্যকে ধরা যায়। অসমীয়া নাথ সাহিত্যর নায়কও গোপীচন্দ্র। সেখানে বলা হয়েছে —

' মএনামতির বিআও হইল মানিকচন্দ্রের ঘরে
সিন্দুরমতির বিআও হইল নিলমণি রাজার ঘরে।'

গীতি রামায়ন ও বেহুলা আখ্যান রচয়িতা কবি দুর্গাবর রাজা বিশ্বসিংহের সমসাময়িক। তিনি বলেছেন,

'কমতা ঈশ্বর বন্দো বিশ্বসিংহ নৃপবর
আটচল্লিশ মহিষী বন্দো উঠর কোঙর।'

নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

' শ্রী কায়স্থ চন্দ্রধর তান পুত্র দুর্গাবর
বিরচিত গীতি বিতপোন।'

অসমীয়া সাহিত্যের সর্বকালের শ্রদ্ধেয় কবি শঙ্করদেব, যিনি বিকৃত তন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে রামানুজের বৈষ্ণববাদের উপর ভিত্তি করে বৈষ্ণববাদ প্রচার করেন ও নিজে ব্রাহ্মণ না হয়েও ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সবার গুরু বলে পরিগণিত হন তাঁকে পরবর্তীকালে কোচবিহারের রাজ্যে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছিল কেবলমাত্র তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে। তিনি সীতা স্বয়ংবর নাটক, কৃষ্ণগুণমালা, শ্রীমদ্‌ভাগবতের 'পদ' রচনা করেছিলেন। এছাড়াও আরও কিছু সাহিত্যকর্ম তার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল।

সময়ের অমোঘ নিয়মে অসমীয়া সাহিত্যর স্রোতধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হবার পর থেকে বাংলা সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কোচবিহার অঞ্চলের ভাষা আপন রূপ পরিগ্রহ করে এটুকু বললে বোধ হয় কমই বলা হয়। কোচবিহারকে বাংলা গদ্যর সূতিকাগার বললে অনৃতভাষণ হয় না। ১৪৭৭ শক বা ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অহোমরাজ

পান্ডর যশোরাশি বিরাজিত ত্রিপিষ্ট পত্রিদশতরঙ্গিনী সলিলনির্ম্মলপবিত্রকলেবরধীণধীর ধৈর্যমর্যাদাপারাবার সকল দিক্কগামিনীজীয়মানগুণসন্তান শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ মহারাজ প্রচন্ড প্রতাপেষু।

লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশলনিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে বর্দ্ধিত পাই পুস্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি তোমারো এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধূম সর্দ্দার, উদ্ভন্ড চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গ মৎস ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গইছে। আর সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক, তোমার অর্থে সন্দেশ গোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শঁক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়'।

বাংলা গদ্যর প্রথম লিখিত নিদর্শন বলে গণ্য উপরোক্ত পত্রটি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে জুন আসামের তেজপুর থেকে প্রকাশিত 'আসামবন্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় (গৌরীপুর) অধিবেশনের সভাপতির (পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ) অভিভাষণে (কার্য বিবরণী, পৃঃ-৩৭) এই পত্র পুনর্মুদ্রিত হয়। (১৩) কিন্তু এখানেই শেষ নয়। একদিন একটি রাজকীয় পত্রের মাধ্যমে যার সূচনা হয়েছিল কালক্রমে তা শতধা বিচ্ছুরিত হয়েছে। কোচবিহারের মহারাজাদের অনেকেই নিজেরা সাহিত্য রচনা করতেন এবং প্রায় প্রত্যেকেই সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মহারাজ নরনারায়ণ ও তাঁর রানীর উৎসাহে ১৪৯০ শকাব্দে, ১৫৬৮ খ্রীঃ পন্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ 'প্রয়োগরত্নমালা' রচনা করেন। পন্ডিত অনিরুদ্ধ ও রাম সরস্বতী রাজার আদেশে অষ্টাদশ পুরাণের পদ পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। শ্রীধর দৈবজ্ঞ 'জ্যোতিষ' নামে নিবন্ধ ও বকুল কায়স্থ 'ভূমি পরিমাণ' নামে গ্রন্থ রচনা ও 'লীলাবতীর অনুবাদ করেছিলেন। তাছাড়া 'অঙ্কর পুঁথি' ও পদ্য রচনা করেছিলেন। মহারাজ নিজে 'মল্লদেবী' অভিধান রচনা করেছিলেন বলে বলা হয়, যদিও সাধারন্যে ঐ পুঁথি দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে তিনি দিল্লীর বাদশা আকবর শাহের প্রশংসাসূচক এক গ্রন্থ রচনা করে দিল্লীতে পাঠিয়েছিলেন বলে 'আকবরনামা'য় উল্লেখ করা হয়েছে। (১৪) পরবর্তী মহারাজ প্রাণনারায়ণ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর 'পঞ্চরত্ন' পন্ডিতসভা ছিল। মহারাজ প্রাণনারায়ণের নির্দেশে কবিরত্ন 'রাজ খন্ডম' নামে রাজবংশের ইতিহাস সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। তাঁরই নির্দেশে শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ 'মহাভারতের পদ ও 'দ্রৌপদী স্বয়ংবর' কাব্য রচনা করেন। শ্রীনাথ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'বিশ্বসিংহচরিতম' নামে একটি অসম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেছে। এই সময় দ্বিজ রামেশ্বর মহাভারতের পদ ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র 'প্রহ্লাদচরিত' রচনা করেন। বিশারদ কবি বিরাটপর্ব্ব ও কর্ণপর্ব্ব অনুবাদ করেন। তাছাড়া এই সময় রাম রায় রচনা করেন 'গুরুলীলা'।

মহারাজ প্রাণনারায়ণের নির্দেশে জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য 'প্রয়োগরত্নমালা' ব্যাকরণের ' প্রভা প্রকাশিকা টীকা রচনা করেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণ নিজে সঙ্গীত বিষয়ক কিছু গ্রন্থ রচনা করেন যেগুলি পরবর্তীকালে অগ্নিদাহে বিনষ্ট হয়।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের মন্ত্রী বিরুপাক্ষ কার্যীর অনুরোধে মাধবদেব 'নামমালিকা' গ্রন্থের অনুবাদ করেন। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের নির্দেশে ১৫৩৮ শকাব্দ বা ১৬১৬ খ্রীঃ সিদ্ধান্তবাগীশ রচনা করেন 'শিবরাত্রিকৌমুদী', 'মন্ত্রদীক্ষা কৌমুদী', 'সংক্রান্তিকৌমুদী', 'একাদশীকৌমুদী' ও 'গ্রহণকৌমুদী'।

বিভিন্ন সময়ে কোচবিহারের বিভিন্ন রাজাদের উৎসাহ ও সমর্থনে যে অনুবাদ সাহিত্যগুলি রচিত হয় তার অনেকগুলি বর্তমানে মূল বা অনুলিপিসহ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। সংরক্ষিত এই পান্ডুলিপিগুলি প্রধানতঃ দুই প্রকার। (ক) বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে রচিত পান্ডুলিপি, (খ) কোচবিহার রাজ বিশ্বসিংহ (১৪৬৩-১৫৬৩ খ্রীঃ) থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের সময় পর্যন্ত রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত পান্ডুলিপি ; সংশ্লিষ্ট পান্ডুলিপি সম্পর্কে তথ্যাদি সারণীর আকারে পরবর্তী পাতায় দেওয়া হল —

পান্ডুলিপি নং	পান্ডুলিপির নাম	রচয়িতা	সময়
১.	ষড়ঋতু বর্ণনা	দ্বিজ ভূতনাথ	তাং নাই
২.	বৃহদ্ধর্ম পুরাণ-মধ্যম খন্ড (অসম্পূর্ণ)	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ	তাং নাই
৬.*	উপকথা	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ	১৩৩৪(১মখন্ড, ১৩৩৫(২য় খন্ড)
১১.	রাজপুত্র উপাখ্যান	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ	
২০.	ক্রিয়া যোগসার	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ	
২২.	বৃহদ্ধর্ম পুরাণ-উত্তর খন্ড	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ	৩২৬ বিশ্বসিংহ অব্দ / ১২৪২ শকাব্দ
২৩.	স্কন্ধপুরাণ, ব্রহ্মোত্তর খন্ড	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ	তাং নাই
৬০.	রামায়ন, সুন্দর কান্ড	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ	তাং নাই
৬৫.	রামায়ন, সুন্দরকান্ড (অসম্পূর্ণ)	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ	১৯ শ' শতক
৭৩.	মহাভারত - ঐশিক পর্ব্ব	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ	তাং নাই
৮০.	মহাভারত - শল্যপর্ব্ব	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ	তাং নাই
৭৬.	মহাভারত - সভাপর্ব্ব	জয়দেব ও দ্বিজ ব্রজসুন্দর	১৯ শ' শতকের প্রথম
৪.	রাজবংশাবলী	রিপুঞ্জয় দাস	১৯ শ' শতক
৫৫.	ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ব্রহ্ম খন্ড	রিপুঞ্জয় দাস ও গৌর দাস(?)	১৯ শ' শতক
৫.*	জন্মাষ্টমী	দেবনাথ দ্বিজ	—
৭.	নৃসিংহ পুরাণ (অসম্পূর্ণ)	দ্বিজ রামনন্দন ও ব্রজসুন্দর	১৭৭৭ শকাব্দ
৬৮-এ.	রামায়ণ - লঙ্কাকান্ড (অসম্পূর্ণ)	দ্বিজ ব্রজসুন্দর	১৯ শ' শতক
৬২.	রামায়ণ - লঙ্কাকান্ড	দ্বিজ ব্রজসুন্দর	১৯ শ' শতক
৯.	হিতোপদেশ	দ্বিজ ব্রজসুন্দর	১৭২৩ শকাব্দ
২৪.	হিতোপদেশ	ব্রজসুন্দর শর্মা	১৭২৩ শকাব্দ/ ৯ম শতকের ১ম
৫৭.	ধর্মপুরাণ	দ্বিজ রামনন্দন	১৯১৯ শকাব্দ
৫৭-এ.	ধর্মপুরাণ	দ্বিজ রামনন্দন	১৯১৯ শকাব্দ
৭৫.	মহাভারত -গদাপর্ব্ব	দ্বিজ রামনন্দন	১২১৯ বঙ্গাব্দ
৮৮.	মহাভারত - শল্যপর্ব্বের গদাপর্ব্ব	দ্বিজ রামনন্দন	তাং নাই
৮.	মার্কন্ডেয় পুরাণ (উত্তরপূর্ব বঙ্গ ও আসামের অনেক অঞ্চলের কথ্যভাষায় লিখিত)	পিতাম্বর	১৫২৪ শকাব্দ
১৩.	মার্কন্ডেয় পুরাণ (উত্তরপূর্ব বঙ্গ ও আসামের অনেক অঞ্চলের কথ্যভাষায় লিখিত)	পিতাম্বর	১৫২৪ শকাব্দ
৫৮.	ভগবত -১০ম স্কন্ধ	পিতাম্বর	১৫২৪ শকাব্দ
১০.	ভাগবত - ৬ঠ স্কন্ধ (অসম্পূর্ণ)	দ্বিজ জগন্নাথ	১৯ শ' শতক
১২.	ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ - প্রকৃতি খন্ড (অসম্পূর্ণ)	বৈদ্যনাথ	১৯ শ' শতক

পাণ্ডুলিপি নং	পাণ্ডুলিপির নাম	রচয়িতা	সময়
১৮.	পদ্মপুরাণ (অসম্পূর্ণ)	বৈদ্যনাথ	
১৯.	পদ্মপুরাণ (১ম পাতা নেই)	বৈদ্যনাথ	১১৬৮ বঙ্গাব্দের তন্দ্ররামদেবের অনুলিপি
৫৪.	শিবপুরাণ	দ্বিজ বৈদ্যনাথ	১৯ শ' শতক
৭১.	মহাভারত - মৌষলপর্ব	দ্বিজ বৈদ্যনাথ	১২৩৯ বঙ্গাব্দ
৯৬.	মহাভারত - শান্তিপর্ব	দ্বিজ বৈদ্যনাথ	১৭৭৪ শকাব্দ
১০১.	মহাভারত - বনপর্ব	দ্বিজ বৈদ্যনাথ	—
৯৯.	মহাভারত - বনপর্ব	দ্বিজ বৈদ্যনাথ, মহীনাথ, পরমানন্দ, রঘুনাথ	—
১৪.	মার্কণ্ডেয় চণ্ডী	মহীনাথ শর্মা	—
৭০.	মহাভারত - প্রস্থানিক পর্ব	মহীনাথ	১৯ শ' শতক
৯১.	মহাভারত - অশ্বমেধ পর্ব	দ্বিজ মহীনাথ	১৭৫৪ শকাব্দ
১৬.	শিবসঙ্গীত বা শিব সঙ্কির্তন	রামেশ্বর	—
২৭.	সমস্তকোপাখ্যান	দ্বিজ রামেশ্বর	—
১৭.	চণ্ডীমঙ্গল বা অভয়ামঙ্গল (অসম্পূর্ণ)	কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	১৯ শ' শতকের অনুলিপি
২১.	বিষ্ণুপুরাণ	মাধবচন্দ্র শর্মা	—
২৯.	চণ্ডীকার ব্রতকথা	মাধবচন্দ্র শর্মা	—
৭২.	মহাভারত - স্বর্গারোহন পর্ব	মাধবচন্দ্র শর্মা	১৭৫৪ শকাব্দ
২৫.	কাশী খন্ড (অসম্পূর্ণ)	সারদানন্দ দাস	২৯৫ রাজশক
৬৩.	রামায়ন - উত্তরকান্ড	সারদানন্দ দাস, সত্যানন্দ ও রঘুরাম	১৭২৯ শক (?)
২৮.	নারদীয় পুরাণ	দ্বিজ নারায়ণ	১২০৮ বঙ্গাব্দ
৩০.	শ্রীচৈতন্য ভাগবত - আদ্য খন্ড	বৃন্দাবন দাস	—
৩১.	শ্রীচৈতন্য ভাগবত - মধ্য খন্ড	বৃন্দাবন দাস	—
৩২.	শ্রীচৈতন্যভাগবত - অন্ত্য খন্ড	বৃন্দাবন দাস	—
৩৪.	বৈষ্ণব বন্দনা	বৃন্দাবন দাস	—
৩৫.	চৈতন্যগীতা	কালিদাস	—
৩৬.	হরিনাম কবচ	কৃষ্ণদাস	—
৩৭.	ভক্তি বিরচনা	কৃষ্ণদাস	১২৫০ বঙ্গাব্দ
৪৪.	বৃন্দাবনধ্যান	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	১৭৪৯ বঙ্গাব্দ
৩৯.	কলঙ্ক ভঞ্জন	মুকুন্দ দাস	১৯ শ' শতক
৪০.	অর্জুন সংবাদ	মুকুন্দ দাস	১২২৩ বঙ্গাব্দ
৪১.	সাধন ভক্তি চন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস	১৭৫ বৎসর পূর্বে
৪৩.	সরণি-টীকা	রূপ ও সনাতন গোস্বামী	১২২৮ বঙ্গাব্দ
৪৬.	হংসদূত (অসম্পূর্ণ)	নরসিংহ দাস	—
৪৭.	হংসদূত	নরসিংহ দাস	—

পান্ডুলিপি নং	পান্ডুলিপির নাম	রচয়িতা	সময়
৫১.	গীত-গোবিন্দ (অসম্পূর্ণ)	জগৎ সিংহ	—
৫২.	গীত-গোবিন্দ (অসম্পূর্ণ)	জগৎ সিংহ	২০০ বছর পূর্বে
৫৩.	পদ্ম-পুরাণ	নারায়ণ দেব	আনুমানিক ৩০০ বছর
৫৫.	জগন্নাথ মাহাত্ম্য	ভারতী মুকুন্দ	—
৫৯.	রামায়ন	অদ্ভুতাচার্য	—
৬১.	রাম-রসায়ন	রঘুনন্দন	—
৬৪.	রামায়ন - অরণ্যকান্ড	রুদ্রদেব শর্মা	১৭২৯ শকাব্দ
৬৬.	রামায়ন - অযোধ্যা কান্ড	রঘুরাম	—
৮১.	মহাভারত - ভীষ্মপর্ব(অসম্পূর্ণ)	দ্বিজ রঘুরাম	—
৮৩.	মহাভারত - শান্তিপর্ব	দ্বিজ রঘুরাম	বিশ্বসিংহ নৃপতি শকাব্দ
৯৩.	মহাভারত - ভীষ্মপর্ব (অসম্পূর্ণ)	দ্বিজ রঘুরাম	—
৯৫.	মহাভারত - ভীষ্মপর্ব	দ্বিজ রঘুরাম ও দ্বিজ সরস্বতী	—
৬৭.	রামায়ন - কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড(অসম্পূর্ণ)	দেবীনন্দন, শ্রীনাথ দ্বিজ ও দ্বিজ রঘুরাম	১৯ শ' শতকের ১ম
৬৮.	রামায়ন - কিষ্কিন্ধাকান্ড (অসম্পূর্ণ)	দেবীনন্দন, শ্রীনাথ দ্বিজ ও দ্বিজ রঘুরাম	১২১৫ বঙ্গাব্দ
৮১.	মহাভারত - ভীষ্মপর্ব	দ্বিজ রঘুরাম	—
৮৩.	মহাভারত - শান্তিপর্ব	দ্বিজ রঘুরাম	বিশ্বসিংহ নৃপতি শকাব্দ
৬৯.	মহাভারত - নলদময়ন্তী উপাখ্যান - বনপর্ব	রাম নারায়ন	১২৩২ বঙ্গাব্দ
৭৭.	মহাভারত - আদিপর্ব	শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ	১৭১৮ শকাব্দ
৭৮.	দ্রৌপদী স্বয়ংবর	শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ	১২০৮ বঙ্গাব্দ
৭৯.	মহাভারত - কর্ণপর্ব	লক্ষ্মীরাম	১৭৭১ শকাব্দ
৮২.	মহাভারত - কর্ণপর্ব	দ্বিজ লক্ষ্মীরাম	১৭৭১ শকাব্দ
৮৪.	মহাভারত - আশ্রমিক পর্ব(অসম্পূর্ণ)	দ্বিজ কৃত্তিচন্দ্র	—
৮৫.	মহাভারত - দ্রোণপর্ব (অসম্পূর্ণ)	শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ ও দ্বিজ কবিরাজ	১৭ শতকের ২য় অধ
৯৭.	মহাভারত - দ্রোণপর্ব (অসম্পূর্ণ)	শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ ও দ্বিজ কবিরাজ	১৭ শতকের ২য় অর্ধ
৮৬.	দ্রৌপদী স্বয়ংবর	শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ	—
৮৭.	দ্রৌপদী স্বয়ংবর	শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ	—
৮৯.	মহাভারত - ভীষ্মপর্ব	দ্বিজ কবিরাজ	—
৯০.	মহাভারত - কিরাতপর্ব	কবিশেখর	১৫২৭ শকাব্দ
৯২.	মহাভারত - আদিপর্ব	দ্বিজ রুদ্রদেব	১২৪০ বঙ্গাব্দ
৯৮.	মহাভারত - বনপর্ব (অসম্পূর্ণ)	দ্বিজ পরমানন্দ	৩৮৮ রাজশক
১০০.	মহাভারত - বনপর্ব	দ্বিজ বলরাম	—
১০২.	মহাভারত - রাজসূয় (অসম্পূর্ণ)	অনন্ত কন্দলী	—
৩.	গরুড়পুরাণ	—	—
২৬.	নাম নাই	—	—
৩৩.	শ্রীভাগবতে বৈষ্ণব চরিত্র	—	১৯ শ' শতক

পান্ডুলিপি নং	পান্ডুলিপির নাম	রচয়িতা	সময়
৩৮.	সহজ চরিত	—	১২৫০ বঙ্গাব্দ
৪২.	মোহমুদগর	—	১২০৮ বঙ্গাব্দ
৪৫.	শিবাগম	—	—
৪৮.	অনামী বৈষ্ণব গ্রন্থ (সারণী টীকা অসম্পূর্ণ)	—	—
৪৯.	গোলক সংহিতা (অসম্পূর্ণ)	—	২০০ বছর আগে
১৫.	মহাভারত (ছেঁড়া ও কীটদষ্ট)	—	—

পূর্বের প্রদত্ত সারণীকে বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় ক্রমিক সংখ্যা ১০২ পর্যন্ত হলেও আসলে পান্ডুলিপির সংখ্যা ১০৫ টি। এর মধ্যে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ এককভাবে দশটি ও মিলিতভাবে একটি পান্ডুলিপি রচনা করেন। এছাড়া বিভিন্ন রাজা রানী ও রাজকুমারদের উৎসাহে যতগুলি পান্ডুলিপি রচিত হয় তার সংখ্যা নিচে সারণীর আকারে দেওয়া হল—

নাম	সংখ্যা
১. মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ	৩০
২. মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের রানী	১
৩. মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণ	১
৪. মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের রানী	১
৫. মহারাজ বিশ্বসিংহের পুত্র সমর সিংহ	২
৬. মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের মন্ত্রী সচ্চিদানন্দন	১
৭. মহারাজ প্রাণনারায়ণ	৪
৮. মহারাজ বীর নারায়ণ	১
৯. মহারাজ মহীন্দ্র নারায়ণ	১
১০. মহারাজ মেদিনীনারায়ণ	১

এছাড়া মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ ও মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণ দুটি করে ও মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ও মহারাজ উপেন্দ্র নারায়ণ একটি করে পান্ডুলিপি রচনার সময় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনুমান করা অসঙ্গত নয় উক্ত চারজন পান্ডুলিপি রচয়িতা এই বিদ্যোৎসাহী রাজাদের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা থেকে হয়ত বঞ্চিত হননি। (১৬)

এতদঞ্চলের রচিত সাহিত্যকর্মের মধ্যে অদ্বৈতবাদের প্রাধান্য লক্ষণীয়, শাক্তমতের প্রাধান্য কমই পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রাজকীয় উদ্যোগে রচিত পান্ডুলিপিগুলি ছাড়াও কিছু কিছু সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল যেগুলি দরবারের সাহিত্যের আঙ্গিনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মুসলমানদের প্রভাবে এদেশে হেয়াত মামুদের 'আম্বিয়ার বাণী', 'জাহনামা' এবং রঙপুরের উত্তর মহীপুর নিবাসী বৈষ্ণব কৃষ্ণহরি দাসের সত্যপীঁড়ের গান, গাজীর গান, নবিনামা উল্লেখ্য। (১৭)

মহরাজ হরেন্দ্র নারায়ণের পরবর্তী রাজা মহারাজ নরেন্দ্র নারায়ণ ১৮৪৭ সালে সিংহাসন আরোহন করার পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮৪৮ সালে তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকার সময় উল্লেখযোগ্য যে ঘটনা ঘটে তা হল রাজ্যে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ। ১৮৫৭ সালে মহারানী বৃন্দেশ্বরী দেবীর চেষ্টায় রাজকুমার ও পরিবারের অন্যান্যদের শিক্ষার জন্য একটি ভার্নাকুলার স্কুল স্থাপন করা হয় ও ১৮৫৯ সালে সেখানে ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়। ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে উত্তর পূর্ব সীমান্তের গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট মেজর জেনারেল ফ্রানসিস্

জেন্‌কিন্সের নামে মহারাজ নরেন্দ্র নারায়ণ জেন্‌কিন্স বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মহারাজ নরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালকে কোচবিহার রাজ্যের আধুনিকিকরণের সূচনাপর্ব বলা যায়। তবে মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে এই আধুনিকিকরণ মধ্যগগনে পৌঁছে যায়। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ১৮৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং একবছর পর পিতার মৃত্যুর পর শৈশব অবস্থায়ই সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর অভিভাবক ছিলেন কর্ণেল হটন। ১৮৭৮ সালের ৬ই মার্চ নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তবে এই ঘটনাটিকে মামুলী একটি ঘটনা হিসাবে উল্লেখ না করে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা বাঞ্ছনীয়। কেশবচন্দ্র সেনের পারিবারিক সান্নিধ্য হয়ত মহারাজকেও সংস্কারপ্রবণ করে তোলে। ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে কোচবিহারে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করা হয়। ১৮৮১ সালে স্ত্রী শিক্ষার জন্য সুনীতি একাডেমী ও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নববিধান ব্রাহ্ম মন্দির ও ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপিত হয়।

তবে মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ সাহিত্যকর্মের সাথে একাই যুক্ত ছিলেন এমন নয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় পরবর্তীকালের কয়েকজন রাজা, রাজকুমার ও রাজবধূ সাহিত্যরচনা ও সাহিত্যপত্র সম্পাদনার সাথে যুক্ত ছিলেন। যেমন প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের স্ত্রী নিরুপমা দেবীর সম্পাদনায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দ থেকে কিছুদিন প্রকাশিত হত সাহিত্যপত্র 'পরিচারিকা' (নবপর্যায়)। তাছাড়া নিরুপমা দেবীর স্বরচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'ধূপ' (প্রকাশনা ১৩২৫ বঙ্গাব্দ), গোধূলি (প্রকাশনা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ), 'শেষের কবিতা' (এটি পূর্বে লেখা হলেও প্রকাশিত হয় ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে) ও 'আমার জীবন' (প্রকাশনা শারদীয় 'এক্ষণ' — কলিকাতা, ১৯৯৪)। মহারাজ জিতেন্দ্র নারায়ণ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে '২৪th of February' ও ১৯১৭ সালে '4th of July' প্রকাশ করেন। দুটি গ্রন্থই কোচবিহার থেকে প্রকাশিত এবং এদের কিছু কিছু কবিতা ইংরেজি ' নন্‌সেন্স ভার্স'-এর পর্যায়ে পড়ে।

সাহিত্যর ইতিহাসবেত্তারা রাসসুন্দরী দেবীর ১৮৭৬ খ্রীঃ প্রকাশিত 'আমার জীবন' গ্রন্থটিকে বাংলাভাষায় লিখিত প্রথম আত্মজীবনী বলে মনে করেন। কিন্তু যথোপযুক্ত প্রচারের অভাবে বৃন্দেশ্বরী দেবী এই সম্মান পাননি, অথচ উপযুক্ততার বিচারে তাঁরই এই সম্মান পাবার কথা। অথচ ১৮৫৯ সালে বৃন্দেশ্বরী দেবী রচিত 'বেহারোদন্ত' প্রথম আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। পরবর্তীকালে ১৯১২ সালে বিনোদিনী দেবীর 'আমার কথা', ১৯১৩ সালে সারদাসুন্দরীর 'আত্মকথা', ১৯১৭ খ্রীঃ প্রসন্নময়ী দেবীর 'পূর্বকথা' প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালে মহারানী সুনীতি দেবী প্রকাশ করেন ' দি অটোবায়োগ্রাফী অব এ্যান্ ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস্ ' নামে একটি আত্মজীবনী গ্রন্থ। সুনীতি দেবী রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল— ' অমৃত বিন্দু', 'কথকতার গান', 'ঝড়ের দোলা' প্রভৃতি। তবে শুধু রাজা বা রাজপরিবারের সদস্যরাই নয়, রাজকীয় সান্নিধ্যে বা উৎসাহে অনেকেই বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ বা ১৯১০ খ্রীঃ খাগড়াবাড়ির ডাক্তার রজনীনাথ চক্রবর্তী রচনা করেন 'ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভারতমাতা'। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে শ্রী দীনদয়াল চৌধুরী 'নৃপেন্দ্রস্মৃতি' নামে নৃপেন্দ্র নারায়ণের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী সম্বলিত একটি পুস্তক রচনা করেন। ইতিহাস যে সবসময় সুবিচার করে না তার উদাহরণ আমরা কোচবিহারের ক্ষেত্রে আরেকবার লক্ষ্য করব। যেমন— শ্যামধন মুখোপাধ্যায় রচিত ' মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' গ্রন্থটিকে অনেকেই বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম আঞ্চলিক ইতিহাসের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। অথচ বাস্তবে দেখা যায় মুন্সী জয়নাথ ঘোষ রচিত 'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থটিতে রাজকীয় প্রশান্তি থাকলেও ঐতিহাসিক উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ১৮৪৭ সালে রিপুঞ্জয় দাস রচনা করেন 'রাজ বংশাবলী'। বস্তুত এই দুটি গ্রন্থই বাংলাভাষায় প্রথম আঞ্চলিক ইতিহাস বলা যায়। ১৮৮২ সালে ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ' কোচবিহারের ইতিহাস' প্রকাশ করেন। তাছাড়া ১৮৮৩ সালে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ' কোচবিহারের ইতিহাস' ও ১৮৯৫ সালে 'দি নেটিভ স্টেটস্ অব ইন্ডিয়া ' নামে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি অবসর গ্রহণের পর ' কূলশাস্ত্র দীপিকা' নামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বংশ তালিকা সম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯৩৮ সালে মহারাজার আনুকূল্যে বাংলা নববর্ষের দিন থেকে সংবাদ ও সাহিত্য পাক্ষিক হিসাবে ' কোচবিহার দর্পণ' প্রকাশিত হতে থাকে যার প্রথম সম্পাদক ছিলেন শ্রী শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ও শ্রী জানকীবল্লভ বিশ্বাস।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, ১৯৪৯ সালের ২৮ শে আগষ্ট তারিখে সাক্ষরিত ভারতভুক্তির দলিল বা Instrument of Accession এর মাধ্যমে ঐ বৎসরের ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে কোচবিহার ভারতভুক্ত হয়।

তবে স্বাধীনতাপূর্ব সময়ের সীমারেখা নির্ধারন করতে গেলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখটিকে ধরাই বাঞ্ছনীয়। কেননা ঐ দিন ভারত যেমন ডোমিনিয়ন হিসাবে স্বাধীনতা অর্জন করে, তেমনি উপমহাদেশের সমস্ত রাজ্যের ন্যায় কোচবিহারের উপর থেকেও ব্রিটিশ Parmountcy বা চূড়ান্ত ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়।

পূর্বে আলোচিত রাজা বা রাজকীয় উদ্যোগে রচিত সাহিত্য ছাড়াও এমন কিছু কিছু সাহিত্যরচনার নিদর্শন পাওয়া গেছে যা দৃশ্যত দরবারী প্রভাবমুক্ত।

তথ্যাদি থেকে প্রাপ্ত গ্রন্থ ও তাদের রচয়িতাদের নাম একটি সারণী আকারে উপস্থিত করা যায়। তবে এর মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তী উভয় সময়সীমাতেই অবস্থান করেন। সারণীটি নিচে দেওয়া হ'ল—(১৮)

ঃ স্বাধীনতাপূর্ব ঃ

রচয়িতার নাম	গ্রন্থের নাম	শ্রেণী
জানকীবল্লভ বিশ্বাস	শোভা, আত্মহত্যার অপরাধ, মনের বিষ, গোড়ায় বিপত্তি, মড়ন আড়াল	উপন্যাস
বিমল চক্রবর্তী	বয়াটে	উপন্যাস
শরৎচন্দ্র গুপ্ত	পান্ডব বনবাস, নরমেধ যজ্ঞ	নাটক
শরৎচন্দ্র ঘোষাল	অভিমানিনী, বারুনী ও যৌতুক	উপন্যাস
মণীন্দ্রনাথ মিত্র	বন্দরের কাল হল শেষ	কথাসাহিত্য
রাধারানী দত্ত	লীলাকমল	কাব্যগ্রন্থ
বিজয় চরণ গুপ্ত	বনৌষধি	প্রবন্ধ
দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ	বাংলা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস	প্রবন্ধ
জগদীশ চক্রবর্তী	কংসের কারাগার	প্রবন্ধ
কালিকুমার ভট্টাচার্য	কম্পারেটিভ পদ্যে মেটিরিয়া মেডিকা	পদ্য ঢঙে ঔষধ পরিচিতি

ঃ স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তী উভয় সময়েই ঃ

রচয়িতার নাম	গ্রন্থের নাম	শ্রেণী
সুবোধ কুমার চক্রবর্তী	রম্যানী বীক্ষ	ভ্রমণ কাহিনী
পুলকেশ দে সরকার	বিপ্লবের পথে, ফাঁসির আশীর্বাদ	কথাসাহিত্য
অমিয়ভূষণ মজুমদার	পঞ্চকন্যা, দীপিতার ঘরে রাত্রি, অমিয়ভূষণের শ্রেষ্ঠগল্প, তন্ত্রসিদ্ধি, দুখিয়ার কুঠি, মহিষ কুড়ার উপকথা, গড় শ্রীখন্ড, বিলাস-বিনয়-বন্দনা, রাজনগর, ফ্রাইডে আইলেন্ড অথবা নরমাংস ভক্ষন ও তাহার পর, মধু সাধু খাঁ, ম্যাকডাফ সাহেব, নির্বাস, বিবিক্তা, উদ্বাস্তু	কথাসাহিত্য

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে রচিত উল্লিখিত গ্রন্থগুলি সাহিত্যবিচারে তেমন উৎকর্ষ না হলেও সমসাময়িক জীবন ও ইতিহাসের বার্তা বাহক হয়েছে এইগুলি। যাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন এঁদের অনেকেই ছিলেন মধ্যবিত্ত বর্ণ হিন্দু বা সম্ভ্রান্ত মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁদের অনেকে আবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রাজদরবারের সাথেও যুক্ত ছিলেন। উল্লেখ করা যায় Neo-mantic Theory in Literature এবং The Positive Science of Ancient Hindus গ্রন্থদুটির রচয়িতা পৃথিবী বিখ্যাত দার্শনিক আচার্য্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশয় দীর্ঘ দিন তদানিন্তন ভিক্টোরিয়া কলেজ ও বর্তমানে আচার্য্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

সামগ্রিক ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, কোচবিহারের মহারাজাগণ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ভাবে যে সাহিত্যিক পরিমন্ডল গড়ে তুলেছিলেন তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোচবিহারে এক সাংস্কৃতিক বাতাবরন গড়ে

105

তুলেছিল। এখানে বলা প্রয়োজন রাজকীয় উদ্যোগের বাইরে যাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টিতেও পরোক্ষভাবে রাজকীয় প্রচেষ্টার ছায়াপাত ঘটেছে। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে। সামাজিক ও সাহিত্যিক এই ঐতিহ্য বহন করেই আমরা স্বাধীনতা পরবর্তী কোচবিহারের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরম্পরা অনুধ্যানে ব্রতী হলাম।

উৎস নির্দেশ

১. কোচ কিংস অব কামরূপ — ই. এ. গেইট
২. কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খন্ড) — খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা
৩. কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খন্ড) — যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী
৪. গ্লিম্পসেস্ অব বেঙ্গল — এ. ক্লড. ক্যাম্বেল
৫. বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় — ড. অতুল সুর
৬. কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খন্ড) — খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা
৭. ক্যাম্বেলের চোখে কোচবিহার — অনুবাদ ঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল
৮. কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খন্ড) — খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা
৯. ক্যাম্বেলের চোখে কোচবিহার — অনুবাদ ঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল
১০. কোচবিহারের কৃষক ও তাহাদের অবস্থা — সত্যেন্দ্র নাথ রায় (সূত্র ঃ কোচবিহারের প্রাচীন কথা)
১১. কোচবিহারের সামাজিক কাঠামো — ড. শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
১২. সেকালের পল্লীসমাজ — ফয়েজ উদ্দিন আহমদ
১৩. অসমীয়া সাহিত্য — সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪. বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস — সজনীকান্ত দাশ
১৫. কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খন্ড) — খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা
১৬. এ ডেস্ক্রিপ্টিভ ক্যাটালগ অব বেঙ্গলী মেনুস্ক্রিপ্টস্ — ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত
১৭. কমতাবিহারী সাহিত্য— পঞ্চানন সরকার
১৮. মধুপর্ণী— কোচবিহার জেলা সংখ্যা

164051 31 DEC 2003